চলমান রাজনৈতিক সংকট উত্তরণের উপায় কোন পথে?

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৩ ডিসেম্বর, ২০০৬)

গত কয়েক সপ্তাহ থেকে আমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমাগতভাবে ঘোলাটে হয়েছে। রাষ্ট্রপতির সামরিক বাহিনী তলবের প্রতিবাদে চারজন বিবেকবান উপদেষ্টার পদত্যাগের পর পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। এখন নির্বাচন যথাসময়ে সবার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হওয়া এবং আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা নিয়েই বিরাট সংশয় দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি এখন সংঘাতের দিকে মোড় নিতে পারে। অবস্থা জাতি হিসেবে আমাদেরকে আজ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কী?

আজ আমাদের সামনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। প্রথমত, যথাসময়ে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান। দ্বিতীয়ত, কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগতমানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে নির্বাচনকে অর্থবহ এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার পথ সুগম করা। তৃতীয়ত, চিহ্নিত সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, লুণ্ঠনকারী, মানবতাবিরোধী অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করে অনেকগুলো অমীমাংসিত ইস্যুর সমাধান এবং দারিদ্র, বৈষম্য ও জঙ্গীবাদের মতো জাতীয় সমস্যাগুলোর অবসান করা।

সুষ্ঠু নির্বাচন আজ সকলেরই কাম্য। কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কী ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রয়োজন? স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনই সবচেয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে সকলের ধারণা। কী ধরনের সহায়ক পরিবেশ তখন বিরাজ করছিল?

আমরা মনে করি, সাতটি উপাদান ১৯৯১ সালের নির্বাচনকে সফল করার ব্যাপারে সহায়তা করেছিল। এগুলো হলো: (১) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নাতীত নিরপেক্ষতা; (২) নির্বাচন কমিশনের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের আস্থাশীলতা; (৩) প্রশাসনের নিরপেক্ষতা (৪) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষপাতিত্বহীনতা; (৫) স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণের একতা; (৬) কালোটাকা ও পেশীশক্তির মালিক তথা দুর্বৃত্তদের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রায় অনুপস্থিতি; এবং (৭) সুষ্ঠু নির্বাচন তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলসমূহের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার। এ সকল অবস্থা কি বর্তমানে বিরাজমান?

(১) **তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা:** আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে দেশে একটি নির্লজ্জ নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। ২০০৪ সালে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধি – যা বিচারপতি কে এম হাসানের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে – ছিল নাটকের সূচনা পর্ব। এরপর নাটকের আরো অনেকগুলো পর্ব মঞ্চস্থ হয়েছে। বিরোধী দলসমূহের 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক' আন্দোলনের মুখে বিচারপতি কে এম হাসানের প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি, দেশব্যাপি অমানবিক বর্বর নৃশংসতা, রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিনের অস্বচ্ছ পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের নামের সুপারিশ রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে আহ্বান, রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের দায়িত্ব ও ভুমিকা সম্পর্কে তালগোল পাকানো, দু'জন বিতর্কিত ব্যক্তির নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদান, তথাকথিত 'প্যাকেজ প্রস্তাব' বাস্তবায়নে প্রধান উপদেষ্টার টালবাহানা, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার একক এবং একতরফা সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্রপতির পক্ষপাতদুষ্ট বক্তব্য ইত্যাদি ছিল এ নাটকের বিকাশমান পর্বসমূহ। নাটকটি ক্লাইমেক্সে-এ পৌঁছে উপদেষ্টাদের মতামত উপেক্ষা করে রাষ্ট্রপতির সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত, যার প্রতিবাদে চারজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। শুধু ১৪ দল ও এর সহযোগীরাই নয়, অনেক সচেতন নাগরিকের দৃষ্টিতে প্রধান উপদেষ্টা এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে ড. ইয়াজউদ্দিন নিরপেক্ষ ভুমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। অনেকের আশংকা, তিনি একটি অদৃশ্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। বস্তুত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার 'নির্দলীয়' চরিত্র আজ বিলুপ্ত হওয়ার পথে এবং এর ভবিষ্যত নিয়ে জনমনে গুরুতর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

(২) **নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থাশীলতা:** সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর। কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এমএ আজিজের তুঘলকি কর্মকাণ্ড, নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কমিশনের ব্যর্থতা, আদালতের নির্দেশ ও আইনের বিধান মানার ক্ষেত্রে কমিশনের অনীহা, সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য জানার অধিকার ভন্ডুল করার লক্ষ্যে কমিশনের প্রচেষ্টা, কমিশনের সংস্কারের ব্যাপারে নিজেদের উদ্যোগহীনতা ইত্যাদি নির্বাচন কমিশনকে একটি জনস্বার্থবিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। দু'জন বিতর্কিত ব্যক্তির কমিশনে সম্প্রতি নিয়োগ প্রদানের ফলে এ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সাধারণ জনগণের আস্থাহীনতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। নির্বাচন কমিশনই যেন আজ সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৩) **প্রশাসনের নিরপেক্ষতা:** বিভিন্ন সরকারের পক্ষ থেকে গত এক দশকের নগ্ন দলীয়করণ ও ফায়দা প্রদানের কারণে আমাদের অনেক প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিরপেক্ষতা আজ চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের ১৯৯৬ সালে জনতার মঞ্চে অংশগ্রহণ, সাবেক জ্বালানী উপদেষ্টা জনাব মাহমুদুর রহমানের উত্তরার অফিসে সরকারি কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক গোপন বৈঠক ইত্যাদি নগ্ন দলীয়করণেরই প্রতিফলন। শুধু তাই নয়, অনৈতিকভাবে বহু মেধাবি কর্মকর্তাকে অবসরে পাঠানো হয়েছে কিংবা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। দলীয়করণ পদ্ধতিতে অযোগ্য এবং অদক্ষরাই লাভবান হয়। তাই আজ আমাদের প্রশাসন শুধু নিরপেক্ষতাই বহুলাংশে হারায় নি, মেধাশূণ্য হওয়ার ঝুঁকিরও মুখোমুখি।

(৪) **আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষপাতিত্বহীনতা:** আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বহুদিন থেকেই শাসকগোষ্ঠী ও তাদের ঘনিষ্ঠদের স্বার্থ সংরক্ষণের কাজেই মূলত নিয়োজিত। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অনেকক্ষেত্রে নগ্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে, এমনকি মানুষ হত্যা করেও দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পার পেয়ে যায়। আমরা আমাদের সেনাবাহিনীকেও বিতর্কের উর্ধ্বে রাখি নি। ২০০১ সালে *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২* সংশোধনের (আইন নং ৫৭) মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে এখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে আমরা নতুন প্রশ্নের উদ্রেক করেছি।

(৫) **জনতার ঐক্য:** দলবাজি ও ফায়দাবাজির রাজনীতির কারণে শিক্ষক, সাংবাদিক, শ্রমিক, ছাত্রসহ আমাদের পুরো জাতি একে অন্যের প্রতিপক্ষ হিসেবে আজ প্রায় মুখোমুখি অবস্থানে। তাই ১৯৯১ সালের স্বৈরাচার বিরোধী জনতার ঐক্য এখন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অধিকাংশ সচেতন নাগরিকই আজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের তথাকথিত 'সিভিল সোসাইটি'র অনেক সদস্যরাও দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে 'ইভিল সোসাইটি'তে পরিণত হয়েছেন। বেসরকারি সংস্থাগুলোর অনেকের বিরুদ্ধেও আজ কোন না কোন দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ শোনা যায়। বস্তুত আমাদের নষ্ট রাজনীতির দুষ্ট ছোবলের কারণে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা আজ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও স্বার্থান্বেষীদের 'দলীয় ছাপ মারার' অপসংস্কৃতি চর্চার ফলে নিরপেক্ষদেরকেও আজ দলীয় ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত এবং চক্রান্তকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

(৬) **রাজনৈতিক অঙ্গনে দুর্বৃত্তদের অনুপস্থিতি:** স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসনের ক্রমবর্ধমান অনুপস্থিতিতে আমাদের রাজনীতি এখন মূলত দুর্বৃত্তদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। বস্তুত রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতিকীকরণ আজ আমাদের সর্বগ্রাসী সমস্যায় পরিণত হয়েছে। দেশের অধিকাংশ ভয়ানক অপরাধী কর্মকাণ্ড এখন পরিচালিত হয় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়, কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোই অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করে। তাই রাজনীতির সংস্পর্শে যারাই আসেন, তাদের পক্ষেই যেন সততা, ন্যায়-নীতি ও নিষ্ঠা বজায় রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে। আশেপাশে তাকালেই আমরা দেখতে পাই, রাজনীতিতে প্রবেশ করে আমাদের এক সময়ের অতি সৎ ও আদর্শবান অনেক ব্যক্তিই নীতিহীন দস্যুতে পরিণত হয়েছেন। তারা আমাদের গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। দেশকে পরিণত করেছেন দুর্নীতিবাজ, কালো টাকার মালিক ও সন্ত্রাসী গডফাদারের এক অভয়ারণ্যে। মূলত আজ আমাদের দেশে 'গডফাদার ডেমোক্রেসি' বা 'দুর্বৃত্তায়িত গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে।

(৭) **সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার:** সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোই যেন আজ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের ইঞ্জিনস্বরূপ। ইঞ্জিন চলমান না থাকলে বা বিকল হলে যেমন বাহন চলতে পারে না, তেমনিভাবে যথাযথ রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্রও কার্যকর হতে পারে না। বস্তুত গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল কার্যকর গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা আমাদের দেশে এমন প্রতিষ্ঠান এখনও গড়ে তুলতে পারি নি। রাজনৈতিক দল পরিচালনার সহায়ক কোন আইন আমাদের নেই। তাদেরকে কোন কর্তৃপক্ষের অধীনে নিবন্ধিত হতে হয় না এবং কোন বিধি-বিধানের তোয়াক্কাও করতে হয় না। ফলে তারা যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হওয়ার স্বাধীনতা ভোগ করে। নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দেয়ার ব্যাপারে যে সামান্য আইনি বাধ্যবাধকতা আছে তাও রাজনৈতিক দলগুলো মেনে চলে না। মূলত আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলসমূহ ছলে-বলে-কলে-কৌশলে ক্ষমতায় যাওয়ার লক্ষ্যে গঠিত সিণ্ডিকেটের ন্যায় আচরণ করে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বৈরাচার ও দুর্নীতির অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত এরশাদকে নিয়ে দুই প্রধান রাজনৈতিক ক্যাম্পের মধ্যেকার অশুভ প্রতিযোগিতা। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রেম ও যুদ্ধের মতো, বাংলাদেশের নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতিতে সব পন্থাই 'বৈধ'। এরই স্বাভাবিক পরিণতি রাজনীতিতে চরম অসহিষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোতে ন্যূনতম বিষয়েও ঐকমত্যের অভাব।

তাই এটি সুস্পষ্ট যে, নির্ধারিত সময়ে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন তা বর্তমানে বহুলাংশে অনুপস্থিত। উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালের পর অবস্থার ক্রমাগত অবনতির ফলে পরবর্তী নির্বাচনগুলো ক্রমবর্ধমান হারে বিতর্কিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বিরাজমান পরিস্থিতির এবং পরিবেশের আমূল পরিবর্তন ছাড়া ২০০৭-এর জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার আশা দুরাশার সমতুল্য। এ অবস্থায় জোর করে একটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন ঘটালে এবং নির্বাচনে বড় দলগুলো অংশগ্রহণ না করলে, নির্বাচনী ফলাফল প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। আর প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আমাদের বিরাজমান সংকট আরো চরম আকার ধারণ করতে পারে। ফলে রাজনৈতিক অঙ্গন আরো উত্তপ্ত ও অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে, যা উগ্রবাদের বিস্তারের জন্য আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

বিপন্ন গণতন্ত্র

নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তার ফলে আমাদের বহু কষ্টার্জিত গণতন্ত্র আজ বিপন্ন। এর অন্যতম কারণ হলো যে, গণতন্ত্র আমাদের দেশে এখন সত্যিকারার্থেই পুরোপুরি নির্বাচনকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ফলে আমরা 'একদিনের গণতন্ত্র' তথা নির্বাচনের দিনের গণতন্ত্র চর্চায় লিপ্ত। কিন্তু নির্বাচনই গণতন্ত্র নয়, নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মাত্র। গণতন্ত্রের জন্য আরো প্রয়োজন গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চা এবং শক্তিশালী ও কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও আমাদের অভিজ্ঞতা বলে – নির্বাচনসর্বস্ব গণতন্ত্র, নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রেরই নামান্তর।

গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি চর্চা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ যে কোন মূল্যে নির্বাচনে জিততে এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। নির্বাচনে হারার আজ কোন অবকাশ নেই, বরং জিততেই হবে। কারণ নির্বাচনে পরাজয়ের 'মূল্য' এখন অত্যাধিক – সম্ভাব্য নির্যাতন, নিপীড়ন, অধিকারহরণ, এমন কি প্রাণহানি। অন্যদিকে বিজয়ের 'পুরস্কার' পরবর্তী পাঁচ বছরের লুটপাটের নিরঙ্কুশ ইজারা। বস্তুত রাজনীতি আজ আমাদের দেশে 'ব্যবসায়ে' পরিণত হয়েছে এবং নির্বাচনে দাঁড়ানো এখন সর্বোৎকৃষ্ট 'বিনিয়োগ'। অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও সত্য, বর্তমানে হাজার হাজার কোটি পরিমাণ কালোটাকা আগামী নির্বাচনে বিনিয়োগের অপেক্ষায় আছে। সন্ত্রাসীরা তাদের বিষ ছোবল মারতে, অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায়, নতুন করে সংগঠিত হচ্ছে, যা অবাধ নির্বাচনের পক্ষে একটি বিরাট অন্তরায় হয়ে পড়বে।

নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রের ক্ষমতার উৎস, জনগণের সম্মতি নয়, বরং পেশীশক্তি ও কালোটাকার মালিক তথা দুর্বৃত্তরা। সঙ্গতকারণেই নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র দুর্বৃত্তদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। এ সকল দুর্বৃত্তদের অনেকেই জনগণের বিশ্বাস ভঙ্গ করে দ্বিধাহীনভাবে লুটপাটে লিপ্ত। বস্তুত নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে নির্লজ্জভাবে চুরি-বাটপারি করার জন্য আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে 'ক্ষমতায়িত' করে আসছি, যদিও এদের মধ্যে অল্প কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। এ সকল অন্যায় সুযোগ-সুবিধাকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে তাই তো তারা পরিবারতন্ত্র কায়েমে আজ বদ্ধপরিকর। এই লুটপাটতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রই এখন আমাদের গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সবচেয়ে বড় হুমকি।

বস্তুত আমাদের গণতন্ত্র আজ রুগ্ন ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এর পরিবর্তনের কোন আলামত দেখা যায় না। আব্রাহাম লিংকন-এর কালজয়ী সংজ্ঞা অনুযায়ী, "গণতন্ত্র হলো জনগণের, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য সরকার, যা কোনদিন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে না।" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের নির্বাচনসর্বস্ব গণতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্বৃত্তদের, দুর্বৃত্তদের দ্বারা এবং দুর্বৃত্তদের জন্য সরকার। তবে এ ধরনের চুরিচামারি ও জনগণের মুখের খাবার কেড়ে নেয়ার তথাকথিত গণতন্ত্র স্থায়ী হবে না এবং হতে পারে না। সাম্প্রতিককালে সারাদেশে উগ্রবাদের উত্থান এমন অস্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রতিফলন বলেই প্রতীয়মান হয়।

উগ্ররা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পেরেছে যে, গণতন্ত্রের নামে দুর্বৃত্তায়ন, জনগণকে ব্যাপক বঞ্চনা ও শোষণ, তাদের ব্যাপক দারিদ্র্য এবং দুঃশাসন স্থায়ী হবে না, তাই তারা তাদের মতো করে পরিবর্তনের পথ বেছে নিয়েছে। তারা ধর্মের শ্লোগান ব্যবহার করে এবং সহিংসতার মাধ্যমে বিরাজমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নস্যাত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। তাই আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর ও অর্থবহ করা না গেলে, দেশে ধর্মান্ধ উগ্রবাদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথই সুগম হবে। এছাড়াও আগত নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ করার ব্যাপারেও উগ্রবাদিরা একটি বিরাট হুমকি।

সুষ্ঠু নির্বাচনই যথেষ্ট নয়

তবে শুধুমাত্র সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনই আমাদের একমাত্র কাম্য ও যথেষ্ট নয়। নির্বাচন অবশ্যই অর্থবহ হতে হবে, যার মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণগত মানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। এটি সুস্পষ্ট যে, নগ্ন ব্যক্তিস্বার্থে নিয়োজিতদের পরিবর্তে আমাদের জন্য আজ প্রয়োজন সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত নেতৃত্ব। বর্তমানের দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক পরিবেশে সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের রাজনীতিতে প্রবেশ করা এবং টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। এ অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে হলে আমাদের গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সুদূরপ্রসারি সংস্কার প্রয়োজন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলের আমূল সংস্কার ছাড়া জনকল্যানে নিবেদিত নেতৃত্বের উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব নয়। কিন্তু রাজনৈতিক দল আপনা থেকে নিজেদের সংস্কার করবে না এবং তা করা তাদের স্বার্থের অনুকূলেও নয়। তাই প্রয়োজন পুনঃগঠিত এবং একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন। নিবন্ধনের শর্ত হতে হবে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা, আর্থিক স্বচ্ছতা ও তাদের মনোনয়ন প্রক্রিয়ার সংস্কার। যাতে কেউ উড়ে এসে জুড়ে বসতে না পারে এবং বিত্তবানরা অর্থের বিনিময়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা 'ক্রয়' করতে না পারে। এ সকল সংস্কারের ফলে সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন সম্ভব হবে, যা সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আসন্ন নির্বাচনকে নিয়ে আমাদের দেশে আজ এক অশুভ অনৈতিক খেলা শুরু হয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের নামে আগামী পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতার রদবদল করে নির্বিঘ্নে লুটপাটতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই এ খেলার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। আমাদের রাজনীতিবিদরা এবং রাষ্ট্রপ্রধান পুরো জাতির ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। বস্তুত আমাদের দেশে গণতন্ত্র হয়ে গিয়েছে, জর্জ বার্নাড শ'র ভাষায়, সস্তা অপশাসনের শেষ আশ্রয়স্থল। তাই আজকের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিরুৎসাহিত না হয়ে এবং নির্লিপ্ত না হয়ে পড়ে, আমাদের চিন্তাশীল নাগরিকদের শক্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে: পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচনী 'খেলা'র নিয়ম-পদ্ধতিতে যথাযথ পরিবর্তন না করে আরেকটি নির্বাচন করলে আমরা কি লাভবান হব, না ক্ষতিগ্রস্ত হব? এতে আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা কি ব্যাহত হবে, না ত্বরান্বিত হবে? তাদের সক্রিয় ভূমিকার ওপরই নির্ভর করবে আগামী দিনের বাংলাদেশ কোনদিকে যাবে। তবে নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয়, আর সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের জন্য দরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সুস্পষ্ট অঙ্গীকার। একইসাথে প্রয়োজন প্রতি কেন্দ্রে নাগরিকের ভিজিলেন্স টীম, যাতে প্রকৃত জনমত ছিনতাই হয়ে না যায়।

যথাসময়ে সবাইকে নিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। অনতিবিলম্বে বিরাজমান সমস্যাগুলোর সমাধান করতে না পারলে নির্বাচন পেছানোর কোন বিকল্প থাকবে না। তখন 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি'র আশ্রয় নিতে হবে। পরস্পর হানাহানি এড়িয়ে প্রধান রাজনৈতিক জোটগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতেই তা হওয়া বাঞ্ছনীয়। (আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ ঐকমত্য সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগটি নিতে পারেন।) নির্বাচন যদি পেছাতেই হয় তা হলে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার বাস্তবায়নের পর এবং অমীমাংসিত ইস্যুগুলোর সমাধান করেই নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন।

সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সংস্কারগুলোকে দু'ভাবে বিভাজন করা যায়। কতগুলো হলো জরুরি পদক্ষেপ যার বাস্তবায়ন এখনই প্রয়োজন, আর অনেকগুলো হলো দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে সংস্কারের বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলো:

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/ সংস্কার	কার দায়িত্ব	নির্বাচনপূর্ব/ নির্বাচনউত্তর
১. নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন	নির্বাচন কমিশন	নির্বাচনপূর্ব
২. ভোটারের জন্য ছবি সম্বলিত পরিচয়পত্র প্রদান	নির্বাচন কমিশন	নির্বাচনউত্তর
৩. *নির্বাচন কমিশনের সংস্কার* (ক) প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন ও কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান (খ) কালো টাকার মালিক, পেশী শক্তির অধিকারী, ঋণ ও বিল খেলাপী, দুর্নীতিবাজ, জঘন্য অপরাধের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত আসামী, দুর্নীতির কারণে চাকুরিচ্যুত সামরিক ও বেসামরিক আমলা, সদ্য (তিন বছরের মধ্যে) অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, নির্বাচনী আইন ভঙ্গের দায়ী দোষী ব্যক্তি, সরকারের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তি প্রমূখকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার বিধান। (গ) নির্বাচনী ব্যয় হ্রাসের কার্যকর উদ্যোগ। এ লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারের উদ্যোগে প্রজেকশন	নির্বাচন কমিশন/ রাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতি একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে এগুলো বাস্তবায়ন করতে পারেন।)	নির্বাচনপূর্ব

মিটিং-এর আয়োজন, প্রার্থীদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে পোস্টার ছাপানো, নিবিড়ভাবে ব্যয় নিরীক্ষণ, ব্যয়ের হিসাবের অডিট করা ও প্রকাশ, সঠিক হিসাব প্রদান না করলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। (ঘ) প্রার্থীদের সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা প্রদানের বিধান এবং এগুলোর প্রকাশ। হলফনামায় প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অপরাধের খতিয়ান, আয়ের উৎস, প্রার্থী ও প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের দায়-দেনার হিসাব, তাদের ব্যক্তিগত/ ব্যবসায়িক ঋণের বিবরণ, সরকারের সাথে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্কের বিবরণ, কালো টাকা সাদা করার তথ্য, জীবনযাত্রা প্রণালীর চিত্রসহ আয়কর রিটার্ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার বিধান। (ঙ) গুরুতর অসদাচারণের কারণে প্রার্থীতা, নির্বাচন ও নির্বাচনী ফলাফল বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে প্রদান। একইসাথে নির্বাচনকালীন অসদাচারণের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনকে এখতিয়ার প্রদান। (চ) কঠোর নির্বাচন আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন। (ছ) 'না ভোটে'র বিধান। (জ) দলের অঙ্গ সংগঠন বিশেষ করে ছাত্র সংগঠন বিলুপ্তিকরণ। (ঝ) বর্তমানের সকল নির্বাচন কমিশনারদেরকে ছুটিতে পাঠিয়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য স্বল্প মেয়াদে তিনজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ প্রদান। ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা প্রমূখের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সকল সাংবিধানিক পদে মনোনয়ন এবং রাষ্ট্রপতি নিয়োগ প্রদান।		
৪. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পুনর্গঠন। রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে অব্যহতি নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে একজন প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ, যিনি নতুন একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। প্রথম উপদেষ্টা পরিষদের ১০ জন এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। (বর্তমান টার্মের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটানো আবশ্যক।)	রাষ্ট্রপতি	নির্বাচনপূর্ব
৫. প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণ।	রাষ্ট্রপতি	নির্বাচনপূর্ব
৬. আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও ফেরারি আসামীদের গ্রেফতার।	রাষ্ট্রপতি	নির্বাচনপূর্ব
৭. *নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ও সংস্কার* (ক) দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা। (খ) সকল আর্থিক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা। (গ) অডিট করা হিসাব-নিকাশ দাখিল ও প্রকাশ। (ঘ) মনোনয়ন প্রক্রিয়ার সংস্করের মাধ্যমে দলের প্রাথমিক সদস্যদের পদ্ধতিগতভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান। (ঙ) দ্রুততার সাথে নির্বাচনী বিরোধ নিস্পত্তিকরণ (আদালতের সহায়তা আবশ্যক)।	রাষ্ট্রপতি/ নির্বাচন কমিশন (রাষ্ট্রপতি একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে এগুলো বাস্তবায়ন করতে পারেন।)	নির্বাচনপূর্ব
৮. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীন ও দুর্নীতিমুক্ত বিচারবিভাগ গঠন। স্বাধীন বিচারবিভাগের অধীনে সকল রাজনৈতিক ও মানবতা বিরোধী হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পাদন।	সরকার	নির্বাচনউত্তর
৯. *জাতীয় সংসদকে প্রতিনিধিত্বমূলক ও কার্যকরকরণ* (ক) নারীদের জন্য ৪০শতাংশ আসন সংরক্ষিত করে এগুলোতে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠান। (খ) সংসদ বর্জনের বিরুদ্ধে ও সংসদে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করে আইন প্রণয়ন। (গ) সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদীয় কমিটিগুলো গঠন, বিরোধীদলের সদস্যদের সংসদীয় কমিটির প্রধান করার বিধান এবং কমিটির স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ। (ঘ) বিরোধী দল থেকে স্পীকার মনোনয়ন এবং দল থেকে স্পীকারের পদত্যাগ করার বিধান। (ঙ) সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের আলোকে সংসদ সদস্যদের আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নিবিষ্ট এবং তাদেরকে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম থেকে বিরতকরণ। (চ) সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন। (ছ) হরতাল, অবরোধ ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন। (জ) সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের বাৎসরিক আয়-ব্যয়, সম্পদ, ঋণ কার্যক্রমের হিসাব, আয়কর রিটার্ন প্রকাশ এবং নৈতিকতা ও সমতার বিবেচনার আলোকে তাদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার (যেমন, ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি) পূনর্মূল্যায়ন।	সরকার	নির্বাচনউত্তর
১০. সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত 'ইলেক্টরাল কলেজে'র মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	সরকার	নির্বাচনউত্তর
১১. আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনিক সংস্কার।	সরকার	নির্বাচনউত্তর
১২. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও একটি ফাইনান্স কমিটির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের ৫০ শতাংশ স্থানীয় সরকারকে প্রদান।	সরকার	নির্বাচনউত্তর
১৩. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার আইন প্রণয়ন।	সরকার	নির্বাচনউত্তর

১৪. দুর্নীতি দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণকরণ, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন সক্রিয়করণ এবং বড় দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান।	সরকার	নির্বাচনউত্তর
১৫. স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ও ন্যায়পাল নিয়োগ।	সরকার	নির্বাচনউত্তর
১৬. দারিদ্র ও বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।	সরকার	নির্বাচনউত্তর
১৭. বিশেষজ্ঞ ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নিয়ে সংবিধান মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন।	সরকার	নির্বাচনউত্তর